International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-III, May 2021, Page No. 19-27
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i3.2021.19-27

ওরে বকুল পারুল ওরে শাল-পিয়ালের বন : অন্তরঙ্গ পাঠ

Dr Goutam Kumar Nag
Associate Professor (French) & H.O.D, Dept of Foreign Languages, University of Burdwan, Burdwan, West Bengal

Abstract

The object of study of the present paper is a song of Tagore: ore bokul pārul ore shāl-piyāler ban. This study is however confined to the poetical aspect of the song; the musical aspect is excluded. From an examination of the available biographical data and an in depth linguistic study of the text at the lexical, morpho-syntactic and semantic levels, we have tried to demonstrate that this song occupies a unique position among the songs of the sub-category basanta (spring) and even in the category prakriti (nature) in terms of circumstantial reality and feelings expressed.

Key words: Tagore's song, ***spring, nature, linguistic study, unique position***

এই নিবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের একটি বসন্তসঙ্গীতের অন্তরঙ্গ পাঠ : ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পিয়ালের বন।[১] সাঙ্গীতিক রূপটি নয়, গানের কাব্যরূপটিই আমাদের আলোচ্য। এই গানের কাব্য অবয়বের সৌন্দর্য আস্বাদনের লক্ষ্যে আমরা গানের বিভিন্ন গঠক উপাদান বিশ্লেষণ করব। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের বসন্ত উপপর্যায়ের এবং সামগ্রিকভাবে প্রকৃতি পর্যায়ের গানের মধ্যে এই গানটির অনন্য অবস্থান নির্ণয় করব।

ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পিয়ালের বন,
কোন্‌খানে আজ পাই
এমন মনের মতো ঠাঁই
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন,
দিয়ে আমার সকল মন॥
সারা গগনতলে তুমুল রঙের কোলাহলে
মাতামাতির নেই যে বিরাম কোথাও অনুক্ষণ
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন,
দিয়ে আমার সকল মন॥
ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পিয়ালের বন,

আকাশ নিবিড় ক'রে
তোরা দাঁড়াস নে ভিড় ক'রে---
আমি চাই নে, চাই নে, চাই নে এমন
গন্ধরঙের বিপুল আয়োজন।
অকূল অবকাশে যেথায় স্বপ্নকমল ভাসে
দে আমারে একটি এমন গগন-জোড়া কোণ---
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন,
দিয়ে আমার সকল মন॥[২]

আলোচ্য গানের অনন্য চরিত্রটি ধরা পড়ে দুটি স্তরে : (১) গানরচনার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি (২) গানের মর্মবস্তু।

গানটি রচিত হয় গুজরাতের অন্তর্গত পোরবন্দরে। বিভিন্ন গানের রচনাস্থান সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রকৃতি পর্যায়ের প্রায় সমস্ত গান রচিত হয়েছে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায়। প্রকৃতি পর্যায়ের মোট ২৮৩টি গানের মধ্যে কেবলমাত্র তিনটি রচিত হয়েছিল ত্রিপুরায়।[৩] ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অথবা বিদেশে কবি আর সব পর্যায়ের গান রচনা করেছেন --- পূজা, প্রেম, বিচিত্র, স্বদেশ --- রচনা করেন নি শুধুমাত্র প্রকৃতি পর্যায়ের গান। প্রকৃতি পর্যায়ের গান বাঁধার জন্য কেন তাঁর পক্ষে বাংলার প্রাকৃতিক পটভূমি অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল, কেন অন্য কোন প্রদেশের বা বিদেশের অপরিচিত নৈসর্গিক পরিমণ্ডল বিশ্বকবির সৃষ্টিচেতনাকে উদ্দীপ্ত করতে পারল না, তা স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয় হতে পারে। কিন্তু এই আলোচনায় যা সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক তা হল এই গানটি বাংলা এবং প্রতিবেশী রাজ্য ত্রিপুরার বাইরে রচিত একমাত্র প্রকৃতি পর্যায়ের গান।

প্রাথমিক পাঠেই গানের ভাববস্তুর স্বাতন্ত্র্যও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সর্বকালের সর্বদেশের সাহিত্যে,কাব্যে বিশ্বসৌন্দর্যের প্রতিভূরূপে ঋতুরাজ বসন্তের অভিবন্দনা। কিন্তু এই বসন্তসঙ্গীতে দেখি বসন্তের অফুরান রূপ-রস-বর্ণ-গান-গন্ধের অফুরান সমারোহ কোনভাবেই সৌন্দর্যপিয়াসী কবিচিত্তকে স্পর্শ করে না। কবিহৃদয়ে সঞ্চারিত অনুভূতি ওদাসীন্য বা নিঃস্পৃহতারও নয়, বিস্মিত হতে হয় যে বসন্তের নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের প্রতি কবি তীব্র অনীহা অনুভব করেন। বকুল, পারুল শালপিয়ালবনের শোভা তাঁর সৃষ্টিচেতনাকে কোনভাবে উদ্দীপ্ত করে না, বরং তাঁর সৃষ্টির পথকে রুদ্ধ করে দেয়। তাদের কাছে তাঁর আবেদন তাঁর দৃষ্টিপথ উন্মুক্ত করে দিতে : "আকাশ নিবিড় করে / তোরা দাঁড়াস নে ভিড় করে"। তাঁর অধৈর্য ঘোষণা " আমি চাই নে, চাই নে, চাই নে এমন/ গন্ধরঙের বিপুল আয়োজন"।

অথচ অন্যত্র দেখা যায় এই গন্ধরঙই তো কবির পরম আকাঙ্ক্ষার ধন। এই গন্ধরঙই তো বিপুল বন্যাধারায় সৌন্দর্যমগ্ন কবিহৃদয়কে উদ্বেল করে তোলে।

বকুলগন্ধে বন্যা এল দখিন হাওয়ার স্রোতে ।
পুষ্পধনু, ভাসাও তরী নন্দনতীর হতে ।।[৪]

কবির আহ্বান সেই প্রবহমান রঙের বন্যাধারায় শুষ্ক হৃদয়কে পরিপৃক্ত করে তুলতে --- সেই সুধারসধারা অমরত্বে উত্তরণ ঘটায় :

ঝরো-ঝরো ঝরো-ঝরো ঝরে রঙের ঝর্‌না।
আয় আয় আয় আয় সে রসের সুধায় হৃদয় ভর্‌-না ॥

সেই মুক্ত বন্যাধারায় ধারায় চিত্ত মৃত্যু-আবেশ হারায়,
ও সেই রসের পরশ পেয়ে ধরা নিত্যনবীনবর্ণা ॥[৫]

এমন বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই গানের আলোচনায় যা প্রাসঙ্গিক তা হল বকুল পারুল শালপিয়ালবনে গন্ধরঙের বিপুল আয়োজন, বসন্তের অনুপম শোভা কবিকে পীড়িত করে, তিনি তার থেকে মুক্তি খোঁজেন।

একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রভাবনাবিশ্বে বসন্ত কেবল ফোটা ফুলের মেলা নয়, ঝরা পাতা, ঝরা ফুলের প্রতিও তাঁর সমান মমত্ববোধ। আরও কোন কোন বসন্তসঙ্গীতে আমরা দেখি বসন্তশোভা কবিহৃদয়েকে স্পর্শ করে না, তাঁর ভাবনা বা ভাবনার বৃহত্তর অংশ জুড়ে থাকে নিসর্গসংসারে যা কিছু অনাদৃত, অবহেলিত। প্রকৃতি পর্যায়ের ২৮৩ নং বসন্তসঙ্গীতটিতে কবির ভাবনা সম্পূর্ণভাবে ঝরাপাতাকে ঘিরে আবর্তিত। তাঁর সঙ্গীতভাবনাবিশ্বে বসন্ত কেবল পর্ণে পুষ্পে তার গান লিখে যায় না, পরম আদরে সে তার গান লিখে যায় ধূলিতলেও

বসন্ত তার গান লিখে যায় ধূলির 'পরে কী আদরে॥
তাই সে ধূলা ওঠে হেসে বারে বারে নবীন বেশে,
বারে বারে রূপের সাজি আপনি ভরে কী আদরে॥[৬]

অশোক পলাশের রাঙা হাসি সকল বসন্তপ্রেমীর হৃদয় স্পর্শ করে কিন্তু ধূলিকণার হাসি শুনতে পান কজন কবি? রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসা এই ধরণীর ধূলিকণা থেকে সুদূর নীহারিকা পর্যন্ত প্রসারিত।তাই কখনও কখনও দেখা যায় বহিরঙ্গ নিসর্গশোভার প্রতি দৃষ্টিপাত না করে যা কিছু অসুন্দর, তুচ্ছ উপেক্ষিত তাকেই মহিমান্বিত করতে তিনি প্রয়াসী হন। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গানটিতে কবির এই সৌন্দর্যবিমুখতাকে সেইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই গানে সমগ্র নিসর্গজগতের সঙ্গেই তিনি দূরত্ব অনুভব করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য পূর্বোক্ত গানগুলিতে বসন্তের ভুবনমোহিনী রূপমাধুরী কবির মনে আকর্ষণ জাগায় না কিন্তু কোথাও দেখা যায় না সেই ইন্দ্রিয়চেতনাগ্রাহ্য সৌন্দর্য এই গানটির মত কোন বিকর্ষণ সৃষ্টি করছে।"আমি চাই নে, চাই নে, চাইনে" --- সৌন্দর্যরসাস্বাদনে এমন প্রবল অনীহার বহিঃপ্রকাশ অন্য কোন বসন্তসঙ্গীতে পরিলক্ষিত হয় না।

অভিনবত্ব কিন্তু শুধু অভিব্যক্ত অনুভূতিতেই নয়, অভিনবত্ব সেই অনুভূতির উপস্থাপনাকৌশলেও। বিশেষভাবে লক্ষণীয় বসন্তের সৌন্দর্যসম্ভারের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করতে তিনি অন্তরায় যে শব্দবন্ধটি প্রয়োগ করেছেন : তুমুল রঙের কোলাহল। "তুমুল" এবং "রঙ" --- বিশেষ্য বিশেষণের এমন মেলবন্ধন আমাদের স্বতস্ফূর্ত ভাষাচেতনাকে আঘাত করে। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে বিশেষণ "তুমুল" বিশেষিত করছে বিশেষ্য "কোলাহল"কে। কিন্তু "রঙ" আর "কোলাহল" --- এই দুই বিশেষ্যের এমন সম্বন্ধনির্মাণও সম্পূর্ণভাবেই অপ্রত্যাশিত। সম্পূর্ণ একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকল্পনির্মাণে তিনি একটি শ্রুতিগ্রাহ্য রূপকল্পকে অবলম্বন করেছেন। অত্যুজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা কবির চেতনায় প্রতিভাত হয় কোলাহলের মত --- অনাকাঙ্ক্ষিত একটি দৃশ্যকল্প হয়ে রূপান্তরিত হয় এক বিশৃঙ্খল, মাধুর্যহীন ধ্বনিতে। এমনি করে দৃষ্টিচেতনা আর শ্রুতিচেতনার মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা যেন অবলুপ্ত হয়ে যায়।

দৃশ্যের ধ্বনিতে রূপান্তরের এমন নির্মাণকৌশল আমরা একাধিক গানেই দেখে থাকি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

"বাজা" ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যাশিতভাবে সম্পৃক্ত কোন ধ্বনিদ্যোতক শব্দ । কিন্তু একাধিক গানে আমরা দেখি এমন ক্রিয়ার কর্তা বা কর্মের ভূমিকা পালন করে "আলো"।

বিচিত্র পর্যায়ের ৪৬ নং গানে বেজে ওঠে আলো :

আলো আমার, আলো ওগো, আলো

...

বাজে আলো বাজে, ও ভাই হৃদয়বীণার মাঝে—[৭]

পূজা পর্যায়ের ৯৯নং গানে বাজানো হয় প্রভাত আলোকে :

বাজাও আমারে বাজাও

বাজালে যে সুরে প্রভাত আলোরে সেই সুরে মোরে বাজাও। [৮]

প্রেম পর্যায়ের **১৩২** নং গানে দেখা যায় আলোর রঙ বেজে ওঠে পাখির গানে :

আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে।

...

আজ **আলোর রঙ যে বাজল পাখির রবে**॥ [৯]

বিচিত্র পর্যায়ের **১৫** নং গানটিতে দেখা যায় কবির আবেশবিহ্বল নয়নে উন্মোচিত মনোরম দৃশ্যাবলী রূপান্তরিত হয় মধুর বীণাঝঙ্কারে :

এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।
শালের বনে খ্যাপা হাওয়া, এই তো আমার মনকে মাতায়।
রাঙা মাটির রাস্তা বেয়ে হাটের পথিক চলে ধেয়ে,
ছোটো মেয়ে ধুলায় বসে খেলার ডালি একলা সাজায়---
সামনে চেয়ে এই যা দেখি **চোখে আমার বীণা বাজায়॥**[১০]

রবীন্দ্রনাথের গানে যে বাদ্যযন্ত্রটির উপস্থিতি সর্বাধিক সেই বাঁশির ধ্বনিও ঝঙ্কৃত হতে পারে শ্রুতিচেতনার পরিবর্তে দৃষ্টিচেতনায় --- নয়নে।

আমার লতার প্রথম মুকুল চেয়ে আছে মোর পানে,

.....

বাজাতে বাঁশরি প্রেমাতুর **দুনয়ানে**॥[১১]

এমন আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এখানে উল্লেখ্য পূর্বোক্ত সমস্ত উদাহরণে দৃশ্যের এমন ধ্বনিতে রূপান্তর ঘটে মুগ্ধ কবিহৃদয়ে কোন ভাবাবেশঘন মুহূর্তে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য এই গানে কবি ঐ নির্মাণশৈলী অবলম্বন করেছেন তাঁর মনের অস্থিরতা, বিরক্তি প্রকাশ করতে। এটি একমাত্র গান যেখানে ইন্দ্রিয়চেতনার রূপান্তরের সঙ্গে জড়িত রয়েছে কোন নেতিবাচক অনুষঙ্গ।

এযাবৎ আমরা আলোচনা করলাম কবির 'না চাওয়া'টুকু। এবার দেখা যাক তাঁর চাওয়াটুকু। গানের বৃহত্তর অংশ জুড়ে দেখা যায় কবি একটি পরিসরের সন্ধানে নিরত ---- যেখানে তিনি তাঁর "সকল মন" দিয়ে "ফাগুন" ভরে দিতে পারবেন। এখানে মনে পড়ে যাবে এই বসন্তসঙ্গীতটি :

একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি--
তাই দিয়ে মনে মনে রচি **মম ফাল্গুনী**। [১২]

"একটুকু ছোঁওয়া" আর "একটুকু কথা" ---- এই অতি সামান্য উপকরণ দিয়ে কবি মনে মনে রচনা করেন আপন "ফাল্গুনী"।কিন্তু আমাদের আলোচ্য গানে কবির "ফাগুন ভরে" দেওয়ার জন্য ওই সামান্য উপকরণটুকুরও প্রয়োজনও হয় না। বিনা উপকরণেই, শুধুমাত্র "সকল মন" উজাড় করেই কবি "ফাগুন" ভরে দিতে চান। তাঁর প্রয়োজন কেবলমাত্র একটি পরিসরের।

যে কোন শিল্পীরই নান্দনিক সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন একটি অনুকূল পরিসরের। কিন্তু এই গানটির সবটুকু জুড়ে রয়েছে শুধুই সেই পরিসরের জন্য কবির নিরন্তর ব্যাকুল প্রয়াস। তাই "যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন,/ দিয়ে আমার সকল মন" --- কলিদুটি একমাত্র সঞ্চারী বাদে আর বাকি তিনটি তুকেই ফিরে এসেছে। এই পৌনঃপুনিক প্রয়োগ যেন এক মন্ত্রোচ্চারণের প্রভাব সৃষ্টি করে।

উক্ত আশ্রিত খণ্ডবাক্যটির অবস্থান আস্থায়ীতে একটি প্রশ্নবাক্যে, অন্তরাতে একটি নঞর্থক বাক্যে, আভোগে একটি অনুজ্ঞাবাক্যে। আস্থায়ীতে বকুল, পারুল শাল পিয়ালের উদ্দেশে উচ্চারিত কবির অধীর জিজ্ঞাসা --- কিন্তু তাঁর অন্বিষ্ট পরিসরটি সম্বন্ধে বিস্তারিত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। শুধু দেখা যায় সেই পরিসরটিকে হতে হবে তাঁর "মনের মতো"। গানের অন্তরা সেই অনুসন্ধানপ্রয়াসের ব্যর্থতার ধারাভাষ্য। সেই "তুমুল রঙের কলাহল" আর সর্বত্র অবিরাম "মাতামাতির" মধ্যে সেই পরিসর খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। এই অংশে সেই কাঙ্ক্ষিত পরিসরের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অতিরিক্ত আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। যাদের রূপসৌন্দর্যের প্রতি তিনি নিঃস্পৃহ, আভোগে সেই বকুল পারুল শাল পিয়ালই হয়ে ওঠে তার পথের দিশারী। তাঁদের উদ্দেশেই কবির কাতর মিনতি সেই পরিসরটির সন্ধান দেওয়ার জন্য। এই আভোগেই আমরা পাই এই পরিসরটির বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে বিস্তারিত বর্ণনা। সেই পরিসরটি হল একটি "গগন-জোড়া কোণ"।পূর্ববর্তী কলিতে তারই বর্ণনায় একটি উপমার প্রয়োগ করা হয়েছে। তারই ভিত্তিতে আমরা সেই স্বপ্নের পরিসরের স্বরূপ বিশ্লেষণ করব।

প্রথমে আমাদের আলোচ্য এই শব্দবন্ধটি : গগন-জোড়া কোণ। রবীন্দ্রনাথের গানে সাধারণভাবে কোণ "ঘর" "চোখ" বা "মন"এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু বিশেষ্য "কোণ"কে বিশেষিত করতে বিশেষণের ব্যবহার নিতান্ত বিরল। আমাদের আলোচ্য গানটি ছাড়া অন্য গানে কোণের সঙ্গে আর যে কটি বিশেষণ আমরা পেয়েছি সেগুলি হল : আপন,[১৩] গোপন,[১৪] দূর,[১৫] দীপহারা[১৬]। কোণকে বিশেষিত করতে উক্ত বিশেষণগুলির মধ্যে কোনটির ব্যবহারই অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গানে ব্যবহৃত বিশেষণ বা বিশেষণীয় পদগুচ্ছটি অভিনব। গগনজোড়া কোণ : এমন শব্দবন্ধনির্মাণের মধ্য দিয়ে "কোণ" তার অতিক্ষুদ্র পরিসরের সীমা অতিক্রম করে গগনের অসীমতায় বিলীন হয়ে যায়, আবার অসীম আকাশ কোণের ক্ষুদ্র সীমায় এসে ধরা দিয়ে যায়।

"সীমার মাঝে অসীম"--- সীমা-অসীমের মিলন কবির ভাবনাবিশ্বের কতখানি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে তার সংকেত আমরা খুঁজে পাই কবির বিভিন্ন রচনায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখে নিয়ে সেই আলোতে আমরা উক্ত শব্দবন্ধটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করব।

সীমা অসীমের পারস্পরিক মিলনাকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি "উৎসর্গ" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ১৭নং কবিতায় :

অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।[১৭]

একাধিক প্রবন্ধেও সেই ভাবনা প্রকাশিত। একটি উদাহরণ :

আমরা ভাষায় যাকে বলি সীমা সেই সীমা ঐকান্তিকরূপে কোথাও নেই, তাই সীমা কেবলই অসীমে

মিলিয়ে যাচ্ছে। আমরা যাকে ভাষায় বলি অসীম সেই অসীমও ঐকান্তিক ভাবে কোথাও নেই, তাই

অসীম কেবলই সীমায় রূপগ্রহণ করে প্রকাশিত হচ্ছেন।[১৮]

"প্রকৃতির প্রতিশোধ" নাটকে সন্ন্যাসী উপলব্ধি করে সীমা অসীমের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই, দুইয়ের মধ্যে বিভাজনরেখা কখন অবলুপ্ত হয়ে যায়। দুইয়ের মধ্যে নিরন্তর এক রূপান্তরের খেলা চলে :

অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।
যাহা-কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অনন্ত সকলি। [১৯]

এইক্ষেত্রে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ "জীবনস্মৃতি" গ্রন্থে, তাঁর "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নাটক বিষয়ে তাঁর মন্তব্যটি :

আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে,

সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনার পালা।[২০]

পূর্বোক্ত উদাহরণগুলির মত কোন ব্যাখ্যায় না গিয়ে, এমনকি "সীমা" "অসীম" শব্দদুটির ব্যবহার না করে শুধুমাত্র একটি অভিনব শব্দবন্ধ নির্মাণ করে না বলা বাণীর ব্যঞ্জনায় সীমা অসীমের মিলনকে আমাদের আলোচ্য এই গানে যেমন করে মূর্ত করে তোলা হয়েছে তা সত্যিই অভাবনীয়।

তাঁর বাঞ্ছিত পরিসরটির স্বরূপ বর্ণনায় কবি কেবলমাত্র বিশেষণীয় পদগুচ্ছের দ্বারা বিশেষিত একটি বিশেষ্য প্রয়োগ করেন নি, সেইসঙ্গে তিনি একটি অভিনব উপমারও আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর অন্বিষ্ট স্থানগত পরিসর তুলনীয় এক কালগত পরিসরের সঙ্গে --- অকূল অবকাশ। এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষণ ও বিশেষণের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত মেলবন্ধন। "অকূল" বিশেষণের প্রয়োগে অবকাশ এক অনন্ত সাগরের রূপ পরিগ্রহ করে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে পূজা পর্যায়ের ১৭৮ নং গানটি :

নিশীথশয়নে ভেবে রাখি মনে, ওগো অন্তরযামী,
...
দিন-অবসানে ভাবি ব'সে ঘরে তোমার নিশীথবিরামসাগরে
শ্রান্ত প্রাণের ভাবনা বেদনা নীরবে যাইবে নামি
ওগো অন্তরযামী ॥[২১]

আমাদের আলোচ্য গানের "অকূল অবকাশ" যেন "বিরামসাগর"কে স্মরণ করিয়ে দেয়। "অবকাশ" "বিরাম" প্রায় সমার্থক --- উভয়ক্ষেত্রে তার উপর আরোপিত সাগরের ব্যাপ্তি। কিন্তু সেই লক্ষ্যে আমাদের আলোচ্য গানে "সাগর" বা তার সমার্থক কোন শব্দ ব্যবহার করা হয় নি শুধুমাত্র সাগরের অনুষঙ্গবাহী একটি বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে কেবল নির্বাচিত বিশেষণের কারণেই নয়, ওই কলিতে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের কারণেও অবকাশ প্রতীয়মান হয় জলরাশির মত। কিন্তু গানের এই অংশে যে সাগরের ব্যঞ্জনা বিধৃত সেখানে ভাসমান বস্তুটিও অভিনবত্বের সৃষ্টি করে : স্বপ্নকমল। কেবল বাস্তবেই নয়, কাব্যেও সাগরে ভাসমান কমলের চিত্রকল্পের অস্তিত্ব নেই। সম্ভবত একমাত্র ব্যতিক্রম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কমলে কামিনীর দৃশ্যটি। কিন্তু তার পটভূমি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গানে সাগরের বুকে স্বপ্নকমলের অবস্থানে সেই সাগর হয়ে ওঠে এক স্বপ্নপারাবার। এমন উপমার প্রয়োগে কবির অন্বিষ্ট পরিসরটি এক দুরবগাহ রহস্যমাধুরীমায়ায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আলোচনার শেষে বলতে হয় এই গানে কেবলমাত্র বাহ্য নিসর্গসৌন্দর্যের প্রতি কবির বিরাগ প্রকাশ পায় নি, সেইসঙ্গে প্রচ্ছন্ন রয়েছে কবির সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধের একটি দিক। লক্ষণীয় এই গানে সর্বাধিক ব্যবহৃত ক্রিয়া হল "দেওয়া'। পুনরাবৃত্ত তিনটি কলিতে আমরা পাই "ভরে দেওয়া" ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ রূপ : "ভরে দেব"। এই দান কিন্তু একমুখী নয়। গানের ষোড়শ কলিতে পাওয়া যায় "দেওয়া" ক্রিয়ার অনুজ্ঞারূপ : "দে"। সব মিলিয়ে এই গানের মধ্য দিয়ে আভাসিত এক বিচিত্র দেওয়া নেওয়ার খেলা।

হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়[২২]

পূজা পর্যায়ের নং গানে কবির ঘোষণা অনুসারে একাধিক গানেই দেখা যায় তিনি যখন যা কিছু দান গ্রহণ করেন --- ঈশ্বরের কাছ থেকেই হোক বা নিসর্গসংসারের কাছ থেকেই হোক --- প্রতিদানের ডালিটিও তিনি পূর্ণ করে দেন। তেমন এক আদান প্রদানের চিত্র দেখি পূজা পর্যায়ের এই গানটিতে :

দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে--দেওয়া তোমায় আমায়-
জনম জনম এই চলেছে, মরণ কভু তারে থামায়?।
...
ওগো, তোমার সোনার আলোর ধারা, তার ধারি ধার---
আমার কালো মাটির ফুল ফুটিয়ে শোধ করি তার।[২৩]

প্রথম কদম ফুলের দানের বিনিময়ে বর্ষণসিক্ত নিসর্গজগতের প্রতি কবির উপহার তাঁর শ্রাবণের গান।

বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান,
আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান॥[২৪]

অবিলম্বে উপলব্ধি করা যায় বর্ষার সেই দান ক্ষণিকের।

আজ এনে দিলে, হয়তো দিবে না কাল---
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল।[২৫]

কিন্তু কবির বাঁধা গান কেবল একটি শ্রাবণদিনের নয়, তাঁর প্রতিদান চিরদিনের :

এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে তব বিস্মৃতিস্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী বহি তব সম্মান॥[২৬]

বর্ষার মত বসন্তের সঙ্গেও কবির এই দেওয়া নেওয়া :

তুমি কিছু **দিয়ে যাও** মোর প্রাণে গোপনে গো--
ফুলের গন্ধে বাঁশির গানে, মর্মরমুখরিত পবনে॥
তুমি কিছু **নিয়ে যাও** বেদনা হতে বেদনে--
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন, যে বাণী নীরব নয়নে॥[২৭]

আমাদের আলোচ্য গানে এই দেওয়া-নেওয়া এক অনন্য মাত্রা লাভ করেছে। কবি নিসর্গলোককে যে দানে পূর্ণ করে দিতে চান সে এক অভিনব দান --- হাসিতে লীন অশ্রু নয়, ফাগুনের গান নয়, তাঁর দান "ফাগুন" --- অদৃষ্টপূর্ব এক ফাগুনশোভা --- যা একান্তভাবেই কবিমনেরই নির্মাণ।আবার তেমনই অভিনব নিসর্গসংসারের কাছে তাঁর প্রার্থিত দান --- শুধু একটি পরিসর --- একটি গগন-জোড়া কোণ।এমন দেওয়া নেওয়ার মিলনের প্রত্যাশাতেই গানের সমাপ্তি :

দে আমারে একটি এমন গগন-জোড়া কোণ--
যেথায় ফাগুন **ভরে দেব** দিয়ে সকল মন,

দিয়ে আমার সকল মন॥[২৮]

উল্লেখপঞ্জী ও টীকা:

১) আমাদের আলোচনার জন্য আমরা নির্বাচন করেছি প্রকৃতি পর্যায়ের (বসন্ত উপপর্যায়ের) ২৬৭ নং গানটি। প্রেম ও প্রকৃতি" পর্যায়ের ৬৭ নং গানটির কথাবস্তু প্রায় এক, কয়েকটি ক্ষেত্রে শব্দচয়নে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন পুনরাবৃত্ত "যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন" কলিটির স্থানে এসেছে "যেথায় আমার ফাগুন ভরে দেব দিয়ে আমার মন"। আরও দুটি কলিতে পার্থক্য দেখা যায়। তবে গানের শেষোক্ত পাঠান্তরটি আমাদের আলোচ্য নয়। আমাদের আলোচনা প্রথমে উল্লিখিত রূপটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।
ভরে দেব দিয়ে আমার মন"

২) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ : ৫৩৩

৩) মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার : গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী, কলিকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিইউট,১৩৯৯, পৃ: ২২০।

গান তিনটি হল : বনে যদি ফুটল কুসুম (প্রেম ২৫৫), ফাগুনের নবীন আনন্দে (প্রকৃতি ২৪৫) দোলে দোলে দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা (প্রকৃতি ১৯৪)। তিনটি গান রচিত হয় ফাল্গুন ১৩৩২ বঙ্গাব্দে, প্রথম গানটি ১০ -১৪। তারিখের মধ্যে এবং পরের দুটি গান ১৫ই ফাল্গুন।

৪) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ : ৫২১ ।

৫) তদেব, পৃ : ৫২৯ ।

৬) তদেব, পৃ : ৫৩১ ।

৭) তদেব, পৃ : ৫৬৪ ।

৮) তদেব, পৃ : ৪৬ ।

৯) তদেব, পৃ : ৩২২।

১০) তদেব, পৃ : ৫৪৯ – ৫৫০।

১১) তদেব, পৃ : ৩২৩ ।

১২) তদেব, পৃ : ৫০৫ ।

১৩) আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে (পূজা /১৪৬) : এই নিরালায় রব **আপন কোণে**।

১৪) আমায় থাকতে দে-নাআপন-মনে (প্রেম/ ৩০৯) : তার স্মরণের বরণমালা গাঁথি বসে **গোপন কোণে**।।

১৫) হে নিরুপমা (প্রেম / ৩৯) : হেরো আকাশের **দূর কোণে কোণে ।**

১৬) চিনিলে না আমারে (প্রেম/ ৩৩৫) : **দীপহারা কোণে** আমি ছিনু অন্যমনে ।

১৭) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : উৎসর্গ ১৭, রবীন্দ্ররচনাবলী পঞ্চম খণ্ড,কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩,পৃ : ৯৪ ।

১৮) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : একটি মন্ত্র, রবীন্দ্ররচনাবলী অষ্টম খণ্ড,কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩,পৃ : ৬৬৬ ।

১৯) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : প্রকৃতির প্রতিশোধ, রবীন্দ্ররচনাবলী পঞ্চম খণ্ড,কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ,২০১৩,পৃ :৩৮২ ।

২০) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ : প্রকৃতির প্রতিশোধ,জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী নবম খণ্ড,কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩,পৃ : ৫০০ ।
২১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : অখণ্ড গীতবিতান, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৩, পৃ : ৮১।
২২) তদেব, পৃ : ২১।
২৩) তদেব, পৃ : ১৪৩-১৪৪।
২৪) তদেব, পৃ : ৪৭৫।
২৫) তদেব, পৃ : ৪৭৬।
২৬) তদেব, পৃ : ৪৭৬।
২৭) তদেব, পৃ : ৫২৬।
২৮) তদেব, পৃ : ৫৩৩ ।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার : রবীন্দ্রসঙ্গীত-বীক্ষা : কথা ও সুর,কলকাতা, জিজ্ঞাসা,১৯৮৩
দাস, ক্ষুদিরাম : চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী, কলকাতা, গ্রন্থনিলয়, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ
বিশ্বাস, অপূর্ব : ঋতুসঙ্গীতে রবীন্দ্র-কবিমানস, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬
রায়, আলপনা (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রনাথের গান সঙ্গ অনুষঙ্গ, কলকাতা, প্যাপিরাস, ২০০১
রুদ্র, সুব্রত (সম্পাদিত) : রবীন্দ্রসঙ্গীত চিন্তা, কলিকাতা, আশা প্রকাশনী, ১৯৮০
সরকার, পবিত্র : রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক সৃজনভিত্তি ,গানের ঝরনাতলায়, কলকাতা,প্রতিভাস , ২০১৩
সর্বাধিকারী, কেতকী : রবির আলোয় ঋতুদের শোভাযাত্রা, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০১৪
সেন, সুকুমার : রবীন্দ্রনাথের গান, কলিকাতা, টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ১৯৮২